বহুভাষিক প্রত্নবিষয়ীর একভাষিক সত্তা

শিবাংশু মুখোপাধ্যায়

১. ভূমিকা

আমার প্রস্তাব, বহুভাষিকতা প্রত্নবিষয়ীর নির্বিশেষ অস্তিত্ব। ক্ষমতা-সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিচয়ের রাজনীতির সাপেক্ষে বিষয়ী একভাষিক সত্তা প্রাপ্ত হয়।

প্রস্তাবের সাতকাহন, তার সপক্ষে যুক্তি, এ-লেখায় ''প্রত্নবিষয়ী'' কাকে বলছি—এসব নিয়ে হাজির হব পরের বিভাগে। ভূমিকায় শুধু বলে রাখা দরকার : (ক) এক্ষেত্রে আমি তাঁদের দলের লোক যাঁরা মনে করেন, একভাষিকতা রাষ্ট্রের[১] তৈরি ধারণা যা বিষয়ী তার পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া বিষয়ীর যে ভাষীসত্তা তা একভাষিক। বহুভাষিক প্রত্নবিষয়ীর একভাষিক 'হয়ে ওঠা' আসলে পরিচয়ের রাজনীতির ফসল। (খ) প্রত্নবিষয়ী আক্ষরিক অর্থেই দামাসিও (১৯৯৯) কথিত প্রত্নসারসত্তা ওরফে প্রোটোসেল্ফ নয়। কারণ দামাসিওর (১৯৯৯ : ১৫৪) মতে, "The proto-self is a coherent collection of neural patterns which map, moment by moment, the state of the physical structure of the organism in its many dimensions." শুধু তাই নয় ওই পৃষ্ঠাতেই তিনি আরও বলছেন, "The proto-self is not to be confused with the rich sense of self on which our current knowing is centered this very moment. We are not conscious of the proto-self. Language is not part of the structure of the proto-self. The proto-self has no powers of perception and holds no knowledge." প্রোটোসেল্ফ-এর বাংলা ''প্রত্নসারসত্তা'' করলাম কারণ দামাসিও বলেই দিচ্ছেন এই অবস্থাটাকে 'rich sense of self'-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

ওদিকে প্রত্নবিষয়ীও তুলনীয়ভাবে বিষয়ীর চেতনের সক্রিয় অবস্থা নয়—বিষয়ীর আদিম-জ্ঞান-অবস্থা, যা জ্ঞান-শূন্য নয় আবার অচেতনও নয়। প্রত্নবিষয়ীত্ব ধারাবাহিকভাবে বিষয়ীর আধার। বিষয়ীকে চেনা যায় সত্তার প্রকাশে। প্রত্নবিষয়ীর অবস্থাটা সত্তাহীন। প্রত্নবিষয়ীর লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ভাষা।

আমার প্রস্তাবের সমর্থনে আলোচনা করা প্রয়োজন পরিচয়ের ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে। অর্থাৎ বহুভাষিক প্রত্নবিষয়ীর একভাষিক সত্তায় আত্মপ্রকাশের পেছনে পরিচয়ের ক্ষমতার যে প্রভাব কাজ করে—সেটা দেখানো দরকার। রাষ্ট্র তার ক্ষুদ্রতম সংস্করণ বিষয়ীকে যে 'একভাষিক' পরিচয় দিচ্ছে, সে পরিচয় তো সামগ্রিক ভাষীসত্তার একটা খণ্ড—এক্ষেত্রে একভাষিক পরিচয়ের ক্ষমতার জোর অন্যান্য অস্তিত্বশীল সত্তার চাইতে বেশি ধরে নিতে হবে। এই কারণেই বিষয়ী বাস্তবের যে মঞ্চে অভিনয় করে সেখানে তার ভূমিকা কী হবে সেটা সে সব ক্ষেত্রে নিজে ঠিক করে নিতে পারে না — সেখানে তাকে পরিচয়ের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ সে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করবে নাকি রাষ্ট্রের বিপ্রতীপ

কোণে অবস্থান করবে তা তৃতীয়, চতুর্থ বা আর কোনো পথ গ্রহণ করবে—সেটা নির্ভর করে — কখন কোন পরিচয় এখানে ওরফে সত্তা তার নির্বাহে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে তার ওপর। বোঝাই যাচ্ছে প্রত্নবিষয়ীকে নির্বিশেষ বহুভাষিক অস্তিত্ব আর রাষ্ট্র-প্রদত্ত সত্তাকে এবং এক্ষেত্রে ভাষীসত্তাকে একভাষিক অবস্থা বলছি।

সমগ্র রচনার সংগঠন বিষয়ে একটা রূপরেখা আগাম জানিয়ে রাখা দরকারি। সেটা এইরকম : বিভাগ ১ অর্থাৎ ভূমিকায় প্রত্নবিষয়ীর নির্বিশেষ অস্তিত্বকে বহুভাষিক বলে প্রস্তাব করছি। সেই সঙ্গে আগাম বার্তা দিচ্ছি পরিচয়ের ক্ষমতার বিন্যাসে প্রত্নবিষয়ী কোন সত্তাকে ব্যবহার করবে সেটা বিশেষ ও তাৎক্ষণিক ব্যাপার। সেখানে তার চয়নের থেকেও জোর বেশি থাকে কোন সরলরেখাটি ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্রের সঙ্গে তার যোগসূত্র নির্মাণ করবে আর কোন সরলরেখাটি রাষ্ট্রের উল্টো দিকে হাঁটবে—তার ওপর। বিভাগ ২-এ দেখাচ্ছি কীভাবে প্রত্নবিষয়ী থেকে বিষয়ী, বিষয়ী থেকে সত্তা 'হয়ে ওঠে'। ২.১-এ আলোচনা করেছি প্রত্নবিষয়ীর অবস্থান ও ধারাবাহিকতা। ২.২-তে রয়েছে প্রত্নবিষয়ীর অন্তঃসার সত্তা, দামাসিও (১৯৯৯) কথিত সারসত্তার গঠন বিষয়ক আলোচনা। বিভাগ ৩-এ আলোচনা করা হয়েছে পরিচয়ের রাজনীতি, কীভাবে রাষ্ট্রীয় সত্তা বিষয়ীর প্রকাশে বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তার সঙ্গে একভাষিক সত্তার পরিচয় ৩.১-এ। ৪ নম্বর বিভাগে থাকছে বহুভাষিকতা ও একভাষিকতার পার্থক্য। কেন বহুভাষিক প্রত্নবিষয়ীর সঙ্গে একভাষিক সত্তার দ্বন্দ্ব চলে? কেন ভারতীয় প্রেক্ষিতে প্লুরিলিঙ্গুয়ালিজমই ঠিক শব্দ, মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম নয়, ইত্যাদি। বিভাগ ৫-এ দেখিয়েছি ভাষীর একভাষিক রাষ্ট্রসত্তা কীভাবে গোলকায়নের রাজনীতিতে কাজ করে। বিভাগ ৫-এ উপসংহার। একভাষিক পরিচয়ের রাজনীতিতে 'ভাষার মৃত্যু' প্রসঙ্গে আলোকপাত।

আর একটা কথা এই নিবন্ধ পাঠ-কালে পাঠককে মনে রাখতে বলবো। কথাটা লেখার পদ্ধতি বিষয়ক। আক্ষরিকতার ওপরেই জোর দিচ্ছি এই লেখায়। সুতরাং লাইনগুলোর ভেতরে অযথা রূপক বা অন্যান্য অলঙ্কার খুঁজে বের করবার দরকার কম। আমি যে কথা বলার চেষ্টা করছি সে কথার মানে আক্ষরিক অর্থেই তাই। যে পন্থায় কথা বললে প্রমাণ দাখিল করার দরকার পড়ে, আমি সেই পন্থাতেই কথা বলছি অথচ আমার হাতে এই মুহূর্তে তেমন কোনো যুতসই প্রমাণ নেই — এমন অবস্থায় যেটা করতে হয় সেটা হল, একটা প্রকল্পনা খাড়া করে আপাতত কথা শুরু করা। সে কাজটা আমি প্রথম প্রস্তাবেই সেরে রেখেছি। অনুমানকেও তো প্রমাণ ধরতে বাধা নেই। অনুমিতির লক্ষণকে প্রত্যক্ষ হিসেবে না ধরে ব্যাপ্তিজ্ঞান হিসেবে যেখানে অনুমানের বিষয় ও তার কারণের গভীর সম্বন্ধ রয়েছে এবং বিষয়ের পক্ষে কারণের জ্ঞান হিসেবে ধরলেই হল।

২. প্রত্নবিষয়ী থেকে বিষয়ী, বিষয়ী থেকে সত্তা

এমন একটা কৌম কল্পনা করা যাক যাদের ''নিজেদের'' কোনো ভাষা নেই। এর অর্থ : কৌমের পরিচয়ের একটা নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস রয়েছে— কিন্তু সেই ঐতিহাসিক পরিচয়ের নিরিখে ওই কৌমের সদস্যরা কেউ আর কৌমের আদিভাষায় কথা বলে না। আধুনিক কোনো ভাষায় কথা

বলে— যা নৃতাত্ত্বিকভাবে ওই কৌমের সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়, যে ভাষা তাদের জীববৈচিত্র্যগত বংশলতিকার সাক্ষ্য বহন করে না— অথচ নতুন প্রজন্ম আধুনিক ভাষাটাকেই তাদের নিজেদের ভাষা বলে জানে। ওই কৌমে আজ আর বয়স্ক এমন কোনো মানুষ বেঁচে নেই যিনি বলে দেবেন—তোমরা এক সময়, হয় এ ভাষা স্বেচ্ছায় শিখে নিয়েছিলে অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে নতুবা রাজনৈতিক পরিচয়ের সুবাদে নিজেদের অজান্তেই তোমাদের ভাষিক অভিপ্রয়াণ ঘটেছে।

এই অবস্থাটা ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের একটা সমীকরণের দিকে তাকাতে হয় : *ওপরে যে কাল্পনিক কৌমের কথা বললাম সেখানে ব্যক্তিবিশেষ নির্বিশেষ প্রত্নবিষয়ীকে বহন করে বেড়াচ্ছে, যার মধ্যে আদিভাষার লক্ষণ রয়েছে সেই কৌমের বর্তমান সামগ্রিক পরিচয়ে অর্থাৎ সত্তায়। বিষয়ী এই দুইয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে।*

আমাদের কাছে যা প্রত্যক্ষ, যা প্রত্যক্ষ নয় অথচ নিজের বা অপরের অভিজ্ঞতা থেকে যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লাভ হয়েছে, সত্যি, মিথ্যে — আমার অস্তিত্বের সাক্ষী, সমস্ত রকম অবস্থাকে আমরা বলি ''বাস্তব''। বাস্তবে যে তার নিজের অস্তিত্ব ও অপর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে সে বিষয়ী। আর যা-কিছু আছে বা নেই—তাই সত্তা[২]।

প্রত্নবিষয়ী বিষয়ী ও সত্তার অতীত এক জ্ঞানের আধার। জ্ঞানহীন নয়। জ্ঞানের সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব। জ্ঞাতার ভিত্তি। প্রত্নবিষয়ী কেবলমাত্র শিশুর অবস্থা নয়। প্রত্নবিষয়ীকে বলতে চাইছি না, শিশুর চেতনের প্রাথমিক অবস্থা বা শিশু মনের অভ্যন্তরীণ সংগঠন অথবা এও বলতে চাইছি না যে যাঁরা শিশুর মনকে সাদা স্লেটের মত ফাঁকা ধরে নিয়ে কথা বাড়ান তাঁদের সেই আচরণবাদী বিশ্বাসের মতো বর্তমান প্রত্নবিষয়ীরও সাদা স্লেটের মতন অবস্থা। *আমি বলতে চাইছি প্রত্নবিষয়ী জ্ঞানের অপ্রত্যক্ষ ভিত্তি।* যতদিন মানুষ বাঁচে ততদিন তার ভেতরে প্রত্নবিষয়ীত্ব থাকে। যা কিছু বিষয়ীর জ্ঞানে প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়ায় — দুঃখ, কষ্ট, রাগ, লোভ— সে সব কিছু তার আয়ত জগতের ব্যাপার, সত্য। বিষয়ী তার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে সমঝোতা করে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যদি রাষ্ট্র-প্রদত্ত পরিচয়কে সে ধারণ করবে বলে মনে করে—সে সেটা করতে পারে। শুধু তাই নয় রাষ্ট্র যে একভাষী ব'লে তার পরিচয় ঠিক করে দেয় সেটাকেই সে সত্যি বলে ধরে নেয়। প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রীয় জ্ঞানকে উপলব্ধির এই ফলশ্রুতি। সে যে বহুভাষিক জ্ঞানের অধিকারী হবার সম্ভাবনা বুকে করে জন্মেছে, সে তো তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কোনো রকম জ্ঞানের আওতাতেই পড়ে না। কারণ এই জ্ঞান রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত। এই কারণে একজন আক্ষরিক অর্থেই বহুভাষিক মানুষ যিনি অবলীলায় একের বেশি ভাষায় কথা বলতে পারেন—তাঁর পরিচয় জিগেশ করলেও তিনি নিজেকে একভাষিক বলে পরিচয় দেন। কারণ বহুভাষিক প্রত্নবিষয়ীত্ব তাঁর কাছে 'খালি' জ্ঞানের জায়গা। অবয়বহীন অস্তিত্ব। সত্তাই (যে সত্তাই হোক-না-কেন) তাঁর কাছে পরিচয়।

কণিক প্রত্নবিষয়ীত্ব যদি না-থাকতো তাহলে মানুষ নিজেকে পাল্টাতে পারতো না। সে কেবল ক্ষমতার দেওয়া সত্তাতেই আত্মপ্রকাশ করতো। সত্তার সংস্কৃতির প্রশ্ন তখনই ওঠে—যখন প্রত্নবিষয়ী বিষয়ীর অন্তরতম সংগঠন হিসেবে জাগরুক থাকে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে

প্রত্নবিষয়ীকে চেনা ভারী শক্ত কাজ। সে যখন আত্মপ্রকাশ করে বলে, 'এই' হচ্ছে আমি, 'এই' আমার পরিচয়, 'এই' আমার স্বপ্ন — তখন সে এক ঝুড়ি মিথ্যেকে সুসংগঠিত করে। কারণ প্রত্নবিষয়ী তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞাতা নয়, জ্ঞাতার ভিত্তি। সুতরাং তার জ্ঞান সত্য হতে পারে না। সে সব সময়তেই নিজেকে প্রকাশ করার সময় 'দরকারি' ও 'তাৎক্ষণিক' সত্তার ওপর নির্ভর করে। তাই প্রত্নবিষয়ী এবং প্রত্নবিষয়ীর স্ব-প্রকাশ এক জিনিস নয়। তাহলে প্রত্নবিষয়ী আত্মপ্রকাশ করলেও যদি সেটা সত্যি না হয়, তাহলে বাস্তবে তাকে বুঝবো কীভাবে?

আবার যাকে বাস্তব জগত বলে ভাবছি—অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তাগুলো সমস্তই বিষয়ীর আয়ত জগতে 'সত্যিই তাই' আর 'সত্যিই তাই নয়'-এর মধ্যে দোল খায়। আর দোল খায় বলে এক অর্থে সবই প্রতিভাস। 'দরকারি' ও 'তাৎক্ষণিক' সত্তা, যেমন রাষ্ট্রসত্তা, ব্যবহারিক—কিন্তু বিষয়ীর মধ্যস্থতায় যখন প্রত্নবিষয়ীকে রঙ্গমঞ্চে টেনে আনার চেষ্টা করা হয়, তখন সেই অর্থে সত্তা প্রাতিভাসিক হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিচয়ের এমনই ক্ষমতা যে সেই প্রতিভাসকে পাল্টে চরম সত্য করে তোলে, রাষ্ট্রীয় একভাষিক সত্তা তখন পারমার্থিক সত্তার মতো সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে।

২.১ প্রত্নবিষয়ীর অবস্থান ও ধারাবাহিকতা

আমি যেমন ছিলাম তেমনই রয়ে যাচ্ছি কোথাও।[৩] গহন গভীর কোনো সত্য সেই 'থাকা'। নিরপেক্ষ ও খালি। সেইখানটায় আমি বহুভাষিক। আমি নিজেও জানি না, টের পাই না সেই অস্তিত্ব। কিন্তু আমি যে এক সত্তা ছেড়ে আর-এক সত্তায় ভর দিয়ে চলি, পাল্টে নিই নিজের পরিচয়, তার পা রাখবার জায়গা সেই খালি জ্ঞাতার জমি। প্রত্নবিষয়ী আমি-র নিজস্ব এলাকা। সেই খালি অবস্থাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। আমি সেই প্রত্ন-অবস্থানে সারা জীবনই বহুভাষিক থেকে যাই। অথচ সে প্রকাশিত হতে গেলেই মিথ্যে হয়ে ওঠে। পাল্টে যায় আমার পোশাক আত্মসত্তার রাজনীতিতে। বহুভাষিকতা আমার সামর্থ্য আর একভাষিকতা আমার নির্বাহ। যে নির্বিশেষ সামর্থ্যের কথা চমস্কি বলেন— সেই সামর্থ্যেই প্রত্নবিষয়ী বহুভাষিক।

তবে বহুভাষিক অবস্থা নির্বিশেষ নয়। প্রত্নবিষয়ীর দেশ-কাল-বিশেষ অবস্থানে তার সেই বহুভাষিক স্বত্ব নির্ধারিত হতে থাকে। সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে এই 'হতে থাকা'-টা নির্বিশেষ। স্বত্ব ধর্ম আছে বলেই প্রত্নবিষয়ী নির্বিশেষ নয়। তার সামর্থ্য অস্তিত্বশীল বলে তার নির্বিশেষত্ব আছে। আবার প্রত্যেক অস্তিত্বের নিজত্ব আলাদা আলাদা। 'স্ব'-তে যাকে ধরা যায় কেবল তারই হেতুগত ব্যাপ্তি পাওয়া যায়। ন্যায় মতে অনুযোগীতে যদি স্বত্বকে ধরতে চাওয়া হয় তাহলে সেটা নির্বিশেষ না হয়ে বিশেষ হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রতিযোগীতে স্বত্বের রূপ সে রকম নয়। লালন ফকিরের গানে যে গিলটি করা রূপের কথা আছে—এও অনেকটা সেই রকম :

> *''স্বরূপে রূপ আছে গিলটি করা।*
> রূপসাধন করলো স্বরূপ নিষ্ঠা যারা।।
> *শতদল সহস্রদলে*

রূপ স্বরূপে ভাটা খেলে।
ক্ষণেক রূপ রয় নিরালে নিরাকারা।।" (নজরটান সংযোজিত)

ক্ষণেক যে রূপ অগোচরে নিরাকার থাকে—সে প্রত্নবিষয়ীর স্বরূপ। রূপ, যেমন আমার একভাষিক সত্তা, সে স্বত্বকে অনুযোগী থেকে প্রতিযোগীতে নিয়ে যায়।

আমি জন্মেছি। আমি নিজে তো সে কথা জানি না। আমি যে আমিই সে কথাও শিখিনি। শুধু এক অপার সম্ভাবনা বুকে করে এই পৃথিবীতে হঠাৎই, একদিন, কোনও এক অনিশ্চিত মুহূর্তে আমি এক, অস্তিত্ব বলবো না বলবো অস্তিত্ব-সংযোগ। সমস্ত কিছুকে সাংস্কৃতিক আমি বলি না। চূড়ান্ত প্রাকৃতিক বলার মতো দৃষ্টবাদীও আমি নই। আমি বলছি, আমি ছাড়া 'বাদবাকি' যা-কিছু উপাদান, যেগুলো 'আমি না-থাকলে থাকতো না'-র মতো বিরোধাভাসকে ছাপিয়ে 'এস্যেন্সিয়াল' হয়ে ওঠে—সেই সার, জগতে অনস্বীকার্য নয়। সার আর অস্তিত্ব কে কাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে সে কথার উত্তর দেবার কাজ সারতে বসি নি এই লেখায়। তর্ক চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। 'মানুষ' বস্তুটাকে এক অখণ্ড নির্বিশেষ সত্তা ভাবা গেলে ভালো হত, ভাবা যায় না। আমরা যে মঞ্চটাকে বাস্তব বলে ডাকি, সেখানে সমস্তই সবিশেষ। এটা আর ওটা, ও আর সে—সবাই, সবকিছুই স্ব-ও-স-বিশেষ। মানুষের আমি-র হয়ে-ওঠার মধ্যেই একমাত্র অস্তিত্ব থেকে চরম অস্তিত্বে যাত্রার পথটা স্পষ্ট করে দেখা যায়। আমি যখন পর্যন্ত নিজেকে আমি বলে চিনতে পারছি না, সেই অবস্থাটার নাম দেওয়া যাক অন্তঃসার সত্তা। শুধু সার ওরফে এস্যেন্স বলছি না। আবার লালন :

"আপনাকে আপনে যে জন জানে,
আপন আত্মাকে দেখেছে নয়নে।
সবে বলে আমি আমি,
আমি কে তা কেউ না জানে।।

ও মন আপনাকে যে চিনেছে,
নিগূঢ় তত্ত্ব সেই পেয়েছে,
সে জন নিগুমে বসে
আগমে ধরে টানে।।" (নজরটান সংযোজিত)

লালন বলছেন, নিজেকে দেখা মানে আত্মাকে দেখা। আমি কে তা কেউ জানে না। অথচ সবাই আমি-আমি করে। আমি-র যে বাস্তব রূপান্তর, অর্থাৎ আমি যাকে প্রত্নবিষয়ীর সত্তায় রূপান্তরের কথা বলেছি—অনেকটা সেই রকম। সেই তত্ত্ব তিনি জানতে পারেন যিনি নিগুমে অর্থাৎ নির্জনে বসে শাস্ত্র চর্চা করেন।

আর একবার মনে করে নেওয়া যাক মোদ্দা বক্তব্যে কী বলতে চাইছি। প্রত্নবিষয়ীর অস্তিত্বের অন্তঃসার হিসেবে একটা কিছুকে অন্তঃসারসত্তা বলে ধরে নিতে হয়েছে—যা অনিশ্চিত কিন্তু বিমূর্ত নয়—চেতনাহীন নয় : সে সারশূন্যও নয়। তৈরি হতে থাকা নানান সত্তা এই অন্তঃসারকে সারবৎ জলজ্যান্ত করে তোলে; যেমন, একটা খণ্ড-রাষ্ট্রসত্তা, এক্ষেত্রে ওরফে

খণ্ড-ভাষীসত্তা। এইভাবে প্রত্নবিষয়ী যখন নিজেকে প্রথম বিষয়ী হিসেবে চিনতে শেখে—তখন গড়ে ওঠে তার আত্মসত্তা। এবার বিষয়ীর অন্তঃসারের সঙ্গে একে-একে গড়ে উঠতে থাকা বাস্তবিক সত্তার যে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের বৃত্তে ক্ষমতার রাশ সবচেয়ে বেশি থাকে রাষ্ট্র-প্রদত্ত সত্তার হাতে। রাষ্ট্র-প্রদত্ত সত্তার সঙ্গে বিষয়ী আপস করে চলে। অনেক সময় আপস জোরালো না হলে আত্মসত্তার ক্ষয় হয়, সে মরতে বসে। বলতে চাইছি জোরের সঙ্গে, যে সত্তা অন্তঃসারকে প্রতিপাদন করবে তার হাতে ক্ষমতা থাকে এবং সে সত্তার অপর সমস্ত প্রকাশকেও নিয়ন্ত্রিত করে।

অন্তঃসার যখন প্রথম পোশাক পরে বাইরে এল তখন তার সামনে প্রথমেই হাতে গরম তৈরি রাষ্ট্রের পোশাক। তার পদবী, তার ধর্ম, তার নাগরিকত্ব, তার মাতৃভাষা। সে চোখে দেখছে সেই সব পোষাকের সম্ভার। কিন্তু তক্ষুণি সে পরে ফেলছে না। কারণ তার মধ্যে তখন জাগরুক প্রত্নবিষয়ী। সে তার অন্তঃসারকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরপরেই শুরু হবে তার প্রশিক্ষণ। পরিবার থেকে। পরিবার তো বকলমে রাষ্ট্রই! এইভাবে তৈরি হতে থাকবে রাষ্ট্রের দেওয়া পরিচয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার পালা।

রবীন্দ্রনাথ "জন্মদিনে"-র ১১ নম্বর কবিতায় যেমন বলেছেন,

"কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ-মাঝে কেন্দ্র রচিল স্বীয়।
বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।"

২.২ প্রত্নবিষয়ীর অন্তঃসার সত্তা, দামাসিও কথিত সারসত্তার গঠন

ক-কে বলা যাক প্রত্নবিষয়ীর অন্তঃসার। খ একভাষিক, রাষ্ট্রীয় পরিচয়। ক-এর সারে খ সংসৃষ্ট—এর মানে, ক-এর সঠিক বা নির্ভেজাল অবস্থা বলে একটা কিছু রয়েছে—যদিও আপতনিকভাবে 'ক', 'খ' হিসেবে প্রতিভাত হয়। কোনোভাবে বর্তমানে ক-কে খ হিসেবে পেশ করার একটা চাহিদা রয়েছে। খ-এর থেকে ক-কে আলাদা করার জন্য—ক-এর স্বায়ত্ত শাসন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। অথচ ক-কে যখন ক হিসেবে অনুভব করি তখন যেন মনে হয় ক-এর স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেই অনুভব করছি।

আবার খ, ক-এর সারে সংসৃষ্ট একথা বলার পরিবর্তে যদি বলি খ-ই হচ্ছে আসলে ক-এর সার যেখানে ক ও খ-এর সম্বন্ধ প্রগাঢ়, সেখানে তার আলগাভাবে লেগে থাকার কোনো চান্স

নেই। তখন ক-এর সার হিসেবে খ বলতে সহজভাবে বোঝায় যে কোনো উপায়েই খ-কে ক-এর থেকে আলাদা করা যাবে না, কারণ ক তো ক-ই, আর ক-ই তো খ-কে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হয় প্রয়োজন হিসেবে, না-হয় ক-এর অবিচ্ছেদ্য ক্ষমতার অঙ্গ হিসেবে।

আসলে ক-এর সঙ্গে খ-এর যে সম্বন্ধ সে বাস্তব। যে কোনো সম্বন্ধকেই বোঝা হয় বাস্তব অথবা বাস্তবের পরম্পরা হিসেবে অর্থাৎ দুই বাস্তব সম্বন্ধীর মধ্যে, কোনো ভিন্ন অথবা কোনো বর্গে সংসৃষ্ট নয়, এমন অবস্থা হিসেবে।

বিষয়ী তো প্রত্নবিষয়ীকে চোখের সামনে দেখতে পায় না। মনে মনে অনুভবও করতে পারে না। তাহলে তো সে যে আত্মসত্তার নির্মাণ করে সে-ও বাইরে থেকে পাওয়া পরিচয়ের সাপেক্ষেই। তাহলে আত্মসত্তার নির্মাণের সাপেক্ষে প্রত্নবিষয়ীকে বুঝবো কী করে! আর বহুভাষিক সত্তার হয়ে ওঠার পক্ষেই বা সওয়াল করবো কী করে? খেয়াল রাখতে হবে আত্মসত্তার নির্মাণকালে বিষয়ীর কাছে এমন সমস্ত গুণাবলী নির্মাণের ফাঁক-ফোকড় থেকে মাথা চারা দিয়ে ওঠে যেগুলো—বোঝা যায় বাইরের নির্বিশেষ ও সামগ্রিক পরিচিত চেতনার চাইতে আলাদা—বিষয়ীকে সেই সব গুণাবলীর অনুশীলন চালিয়ে যেতে হয়। এই সমস্ত আদিম গুণাবলীর উপাদান থেকে গঠন করতে হবে কাল্পনিক প্রত্নবিষয়ীর। নৈতিকতার একটা যুতসই মানদণ্ড খাড়া করে বুঝে নিতে হবে অনুশীলন হবে কোন মাঠে।

এই অনুশীলনকেই নানাভাবে দেখেছি নানা রূপকে— কখনো বলছি আমি-র আবাদি, কখনো বলছি সত্তার সংস্কৃতি, আবার বলছি সত্তার প্রতি যত্নবান হওয়া। যত্নবান না হলে ক্ষয়—ক্ষয় থেকে মৃত্যু। যত্নবান না হওয়া থেকে সরিয়ে রাখতে হবে একটা জরুরি অবস্থাকে—যাকে বলবো যত্নবান না হতে পারা। বাইরের পরিচয়ের রাজনীতি যখন আগ্রাসী উপনিবেশবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে তখন তার যে নৃশংস, হিংসাত্মক চেহারা আমরা দেখি—তার ভয়ঙ্কর প্রতাপে আত্মসত্তার আবাদি নষ্ট হয়ে যায়—প্রত্নবিষয়ী পুনর্নির্মাণ সেখানে আর হয়ে ওঠে না। আর সেই নির্মাণ যদি সম্ভব না হয়—তাহলে ক্ষয় হতে থাকে — শেষ হতে থাকে। আর এই ক্ষয় যখন কোনো ব্যক্তিমানুষের না হয়ে একজোট মানুষের এক সঙ্গে হয়—তখন কৌম মারা যায়।

তাহলে কি ভাষার মৃত্যুকে প্রত্নবিষয়ীকে নির্মাণ করতে পারার অক্ষমতা-জনিত কারণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সুবিধা হবে? তাহলে কি বুঝতে সুবিধা হয় — কীভাবে কোনো ভাষিক কৌমকে সংরক্ষণ—বা নথিবদ্ধ না করে — পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব?

এখানে আমাদের কর্তব্য "প্রত্নসারসত্তা" বলতে দামাসিও (১৯৯৯) কী বুঝিয়েছে সেটা জেনে নেওয়া। আরও বলা জরুরি, ১৯৯৯-এর মতো পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক কগ্‌নিশন পত্রিকায় পারভিজি-ও-দামাসিও-র কাজেরও (২০০১) নিরিখ ছিল স্নায়ুজীববিজ্ঞান। আমার অবস্থান ভাষাবিজ্ঞানের মঞ্চে।

আসুন দেখে নিই প্রত্নসারসত্তা বলতে দামাসিও কী বলতে চাইছেন। আমরা জানি, সচেতনা (কনসাস্‌নেস) এবং মস্তিষ্ককাণ্ড (ব্রেইনস্টেম) পরস্পর সংযুক্ত। দামাসিও (১৯৯৯) প্রস্তাব

করলেন, সচেতনায় মস্তিষ্ককাণ্ডের ভূমিকাকে নতুনভাবে বুঝতে হবে। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন কীভাবে মস্তিষ্ককাণ্ডের নিউক্লিয়াসগুলো সেরিব্রাল কর্টেক্সের গঠনকে প্রভাবিত করে। মস্তিষ্ককাণ্ডের নিউক্লিয়াসগুলোকে বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবা হচ্ছিল জীবনের প্রবিধানের সঙ্গে যুক্ত হিসেবে। হাইপোথ্যালামাসের কাছাকাছি যে সমস্ত নিউক্লিয়াস সেগুলোর কাজও জীবনের বিভিন্ন মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু নিউক্লিয়াসগুলো যেগুলো জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে—সেগুলো এবং সচেতনার প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্রের প্রস্তাব এর আগে হয়নি। পারভিজি ও দামাসিও (২০০১ : ১৩৭) দেখালেন,

> "...core consciousness (the simplest form of consciousness) occurs when the brain's representation devices generate an imaged, nonverbal account of how the organism's own state is affected by the organism's interaction with an object, and when this process leads to the enhancement of the image of the causative object, thus placing the object saliently in a spatial and temporal context. The protagonist of core consciousness is the core self, the simplest form of self."

পারভিজি ও দামাসিওর কাজের নতুন প্রস্তাবে কী এল : কীভাবে মস্তিষ্ক মনের অবয়বকে জন্ম দেয় যাকে আমরা একটা বস্তুর ছবি হিসেবে অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় করি। বস্তু বা অবজেক্ট বলতে ওঁরা বুঝিয়েছেন : একজন ব্যক্তি, একটা জায়গা, একটা সুর অথবা এক বিশেষ চিত্তবৃত্তিজনিত অবস্থার সাপেক্ষে অস্তিত্বের বৈচিত্র্য। আর ছবি যে কোনো সংজ্ঞাবহ প্রকরণ (সেন্সরি মোডালিটি) যেমন একটা শব্দের প্রতিকৃতি, স্পৃশ্য প্রতিকৃতি, চিত্তবৃত্তির কোনো দৃশ্যমান চেহারা ইত্যাদি।

তাঁদের মতে প্রথম সমস্যার জায়গা হল : আমরা কীভাবে মস্তিষ্কের মধ্যে চলচ্চিত্র সময় ও স্থান সাপেক্ষে গঠন করি। দ্বিতীয় সমস্যা হল মস্তিষ্ক কীভাবে এই চলচ্চিত্রের ছবি জুড়ে-জুড়ে তৈরি করার পাশাপাশি—জানার কাজ (অ্যাক্ট অফ নোইং)-এর বৃত্তে স্ব-সত্তার (মি) ধারণা আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে জন্মায়? এবং কীভাবে ছবিগুলো আমাদের মনে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থায়—আমাদের একক জৈবসত্তার নিরিখে আকার পায়? দামাসিওরা প্রত্নসত্তার জায়গাটাকে বলছেন আকর-চেতনা। তাঁরা প্রত্নসারসত্তাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে যে সংগঠনটা বোঝা দরকার সেটা এইরকম :

১) বিভিন্ন মস্তিষ্ককাণ্ড নিউক্লিয়াস—যা শরীরী অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শরীরী সংকেতগুলোকে ম্যাপ করে।

২) হাইপোথ্যালামাস এবং মূল অগ্রমস্তিষ্ক।

৩) ইনস্যুলার কর্টেক্স।

তাঁরা আরও বলছেন, "The proto-self is not an interpretation; it is a reference." সেই জায়গায় আমি বলছি প্রত্নবিষয়ী আদিম ব্যাখ্যাতা কিন্তু সে কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে না। সে অস্তিত্বশীল কিন্তু তার অস্তিত্ব বুঝতে অপর অস্তিত্বের ভর তাকে তার নিজের জায়গা

থেকে বিচ্যুত করে। ফলে টের পাওয়া মুশকিল প্রত্নবিষয়ীর অস্তিত্বকে, যদি না বাহ্যিক কোনো প্রতিষ্ঠান তাকে প্রকট করে তোলে।

৩. পরিচয়ের রাজনীতি : সত্য প্রতিষ্ঠা ও সত্তা প্রতিষ্ঠা

পরিচয় জিনিসটা ঠিক কী? আমরা কি এমন কোনো মানুষকে চিনি যাঁর নাম নেই, ভাষা নেই, নাগরিকত্ব নেই? চিনি না। সকলকে চেনার জন্য কোনো-না-কোনো চিহ্ন লাগে। সেই চিহ্ন-ধারণই পরিচয়ের প্রথম ধাপ। এতক্ষণ যাকে সত্তা বলে এসেছি পরিচয়ের নিরিখে সেটাই আসলে চিহ্ন। ধরুন, আমি যদি বলি আমি ভালো লোক, তাহলে এই 'ভালো লোক' আমার কোনো সত্তা নয়। কারণ 'ভালো লোক' নামক এই বিমূর্ত ধারণাকে কিছু পরিচিত চিহ্ন ধারণ করতে হয়। যেমন, যদি আমাকে বলা হয় *ভালো লোক* কারণ *আমি গরীবদের প্রতি সংবেদনশীল*। তখন আমার *ভালো লোকত্ব* এক ধরনের সত্তায় পর্যবসিত হয়। এই সত্তা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। আর যদি বলি, *আমি ভালো লোক* কেননা *আমি গরু খাই না, মদ খাই না, ভারতবর্ষ আমার মা, পাকিস্থান খারাপ জিনিস;* তাহলে আমার *ভালো লোকত্ব* তাৎক্ষণিক সর্বোচ্চ মর্যাদা পায়। এই সত্তার প্রকাশে আমি-র ইচ্ছের গুরুত্ব বেশি।

'আমার পরিচয়' বলে আসলে কোনো কথা হয় না। আমি জন্মের পর থেকেই একজন সামাজিক অভিনেতার ভূমিকায় অভিনয় করি। সেই ভূমিকা অপরের নির্ধারিত করে দেওয়া। এতে আমার কোনো হাত নেই—প্রাথমিক পর্যায়ে। মানব শিশু জন্মের পর ঘটা করে নামকরণ করা হয়। খেয়াল করে দেখুন এই নামকরণের পেছনে বংশ যা কোনো বিশেষ ধর্ম ও জাত এমন কি সামাজিক-অর্থনৈতিক মান মর্যাদার প্রশ্ন কাজ করে। বস্তির ছেলের নাম উদ্দালক প্রায় শোনা যায় না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, শুধু নামেও তো সম্পূর্ণ হল না। বংশপরিচয়ের পদবী—সে পদবীর তো নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও জাতগত স্টেটাস রয়েছে।

সুতরাং একটা আগে থেকে ঠিক হয়ে থাকা কোনো একটা ভূমিকায় জন্মের পরেই আমায় নামিয়ে দেওয়া হয়। সরবরাহ করা হয় বুলি, উচ্চারণ, নানান চিহ্ন। সেগুলো একে একে আমার গায়ে পরিয়ে দেওয়া হয় পোশাকের মতো। আমি তখন ঠুঁটো জগন্নাথ। এই পরিচয়ের অর্পণ আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। কিন্তু আমি অচেতন বিষয়ী নয়। আমায় কেউ বলে দেয়নি আমায় যে মঞ্চে নামানো হল সে মঞ্চের ইতিহাস। যেন অমোঘ এক চাকা ঘুরতে থাকে কেবল সামনের দিকে। আমার প্রতীতী জন্মায় এই তাহলে বাস্তব। আমি তখনও ঠিক আমি নই। এই অবস্থাটাকে আমি বলছি প্রত্নবিষয়ী। প্রত্ন-সারসত্তা নয়। সত্তার প্রশ্ন শুরু হয় আরও অনেক পরে। আমি ধরছি সেই মুহূর্তটাকে যখন অন্তঃসারকে সারবৎ করে তোলার কাজ শুরু করে দিচ্ছে রাষ্ট্র তার বিভিন্ন এজেন্সি মারফত। প্রাক-সচেতন সারসত্তা ততদিনে তো সচেতন হয়ে উঠেছে। অথচ সে নিঃসহায়।

কাসেল (২০১০) বলছেন যে সমাজবৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে বলাই যায় সব রকম পরিচয়ই আসলে নির্মিত। বিষয়টা শক্ত হয়ে যায় যখন কীভাবে, কীসের জন্য, কীসের থেকে, কার দ্বারা—এই প্রশ্নগুলো উঠতে থাকে। পরিচয় নির্মাণ, ইতিহাস থেকে, ভূগোল, জীববিজ্ঞান, উৎপাদনশীল ও পুনরুৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান, সংগৃহীত স্মৃতি এবং ব্যক্তিগত ফ্যান্টাসি, ক্ষমতার

সরঞ্জাম এবং ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে তার উপাদান সংগ্রহ করে। কাসেল (২০১০) যা বলেছেন তার বাইরে অজস্র উপাদান রয়েছে পরিচয় তৈরিতে সরাসরি কাজে লাগে। উল্লেখযোগ্য, তিনি বলছেন যে ব্যক্তিসত্তা, সামাজিক কৌম, এবং সমাজ ওই সমস্ত উপাদানগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের প্রয়োজন মতো, সামাজিক স্বতঃসিদ্ধ, সাংস্কৃতিক প্রকল্প অনুযায়ী রূপ দেয়। যে প্রকল্প তাদেরই সামাজিক গঠনে গভীরভাবে গ্রথিত। (ব্যক্তিসত্তা কীভাবে রূপ দেবে? সে তো নিজেই জানে না কী করতে হবে!)

কাসেলের (২০১০ : ৭) প্রস্তাব হল,

> "... in general terms, who construct collective identity, and for what, largely determines the symbolic content of this identity, and its meaning for those identifying with it or placing themselves outside of it."

যেহেতু সবসময় ক্ষমতা-সম্পর্কের বৃত্তেই পরিচয়ের সামাজিক নির্মাণ হয় সেই কারণে তিনি পরিচয় নির্মাণের তিন রকম উৎসকে স্বতন্ত্র করেছেন :

- লেজিটিমাইজিং আইডেনটিটি : সমাজের প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান এই পরিচয় অর্পণ করে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য। তাদের শাসনের সদস্য বাড়ানোর জন্য। এই ধরনের পরিচয় সিভিল সোসাইটি গঠন করে।
- রেজিস্ট্যানস্ আইডেনটিটি : এই পরিচয় অর্পণ করে তারা যাদের অবস্থা থেকে মূল্যবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে অথবা কোনো প্রভাবকের যুক্তিতে তারা পতিত। পরিচয় প্রতিরোধক রাজনীতি।
- প্রোজেক্ট আইডেনটিটি : যখন সামাজিক বিষয়ী, তার কাছে সহজলভ্য উপাদানের ওপর ভিত্তি করে কোনো নতুন পরিচয় নির্মাণ করে তখন সেটা প্রোজেক্ট আইডেনটিটি।

আমার বক্তব্য এই তিন রকমের পরিচয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা চলতে পারে। আর লেজিটিমাইজিং পরিচয়ের পর্বের প্রথম পর্যায়, শূন্য অবস্থান : প্রত্নবিষয়ীর জায়গা। সেটা প্রত্নসারসত্তা নয়। প্রত্নবিষয়ী থেকে সত্তা হয়ে ওঠার পথটা খানিক জৈব খানিক সামাজিক। সরাসরি সামাজিক নয়। অন্তর্লীন সংগঠনে সমাজের যা ভূমিকা তাই। আর যেখানটায় জৈব সেখানটায় কাজ করে দামাসিওর প্রত্নসারসত্তা।

সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন, ভূমিকা অর্থাৎ রোল আর পরিচয় অর্থাৎ আইডেনটিটি এক জিনিস নয়। আমি কার ছেলে, কার বাবা, কী কাজ করি—সেগুলো আমার ভূমিকা। আর আমি হিন্দু, কায়স্থ, ভারতীয়, বাঙালি—এগুলো আমার পরিচয়। ভূমিকা তখনই পরিচয় হিসেবে গড়ে ওঠে যখন বিষয়ী সেটাকে আত্মস্থ করে, সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের দেওয়া ভূমিকায় নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গিয়ে। আমি নিজেও কিন্তু স্বেচ্ছায় পরিচয় গ্রহণ করি—তখন আমি ঠুঁটো জগন্নাথ নই। তার কতগুলো রকমফের রয়েছে। তার মধ্যে একটা-দুটো বলছি।

এক, একটা বিশেষ রাজনৈতিক পর্বে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পর্বে, গোলকায়নের পর্বে—আমায়

আত্মপ্রকাশ করতে হবে। ঐ পর্বগুলো নিজেরাই পর্ব-লক্ষণ উৎপাদন করে। সেই লক্ষণগুলোকেই চিহ্ন হিসেবে আমি ধারণ করতে চাইলাম। ওই সমস্ত সত্তায় আরাম রয়েছে। আরামের রাজনীতিতে আমি যেন অক্ষয়।

দুই, আমি আমার কৌমের সহসদস্যদের থেকে অপর কৌমের সঙ্গে আমার কৌমের যে সাধারণ পরিসর—সেই পরিসর ছাপিয়ে আমি প্রত্নবিষয়ী থেকে সত্তায় যাবার পথটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছি। সেখানে রাষ্ট্র, গোলকায়ন, পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে অস্বীকার করার মধ্যেই ধরতে চাইছি আমার সত্তাকে। আমি মোবাইল ব্যবহার না-করা-কে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। গরুর মাংস খাওয়া-কেও চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করেও এক ধরনের সত্তাগত চিহ্ন ধারণ করতে পারি। সেক্ষেত্রে বিষয়ী জানে সে রাষ্ট্রীয় সীমারেখার বাইরে পা রেখেছে। সারা পৃথিবীর এই রকম বিকল্প সত্তান্বেষীরা আমি নামক বিষয়ীর সঙ্গে আমরা-র সম্পর্ক পাতাবে।

বিবিসি (২০১৬)[৪] রিপোর্ট দিচ্ছে চেমওয়াভি ভাষার একমাত্র প্রতিনিধি জনি হিল জুনিয়র সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে : "I have to talk to myself. There's nobody left to talk to, all the elders have passed on." চেমওয়াভি অ্যারিজোনার এক ট্রাইব[৫]। খেয়াল করলে দেখা যাবে—পরে জনি হিল জুনিয়র জানিয়েছেন, ওই ট্রাইবের ভেতরে অন্যরা, বাচ্ছারা—সবাই বলে তারা চেমওয়াভি ভাষা শিখতে চায় কিন্তু শেখাতে গেলে আর কাউকে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, আগে যেমন বলছিলাম—ওই কৌমের প্রতিনিধিরা অন্য ভাষাকে নিজেদের ভাষা মনে করে নিয়েছে। আমাদের দেশে বুন্দেলখণ্ডে কাজ করতে গিয়েও দেখেছিলাম সেখানে শহরের যুবারা বলছে বুন্দেলখণ্ডী আমাদের ভাষা নয়, আমাদের ঠাকুর্দাদের ভাষা ছিল। আমাদের ভাষা হিন্দী। যাই হোক চেমওয়াভি ভাষার ওই ভাষী যিনি নিজেকে ওই ভাষার একমাত্র ভাষী বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন—তার পেছনেও রাষ্ট্রীয়, তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক এবং নিঃসন্দেহে গোলকায়নের নতুন পরিচয় স্কিমের হাত আছে।

৩.১ একভাষিক সত্তা

তবে খেয়াল করবার ওই কথাটা : "I have to talk to myself." কেন খেয়াল করবার মত, দেখা যাক।

এ-কথা তো সহজেই বোঝা গেছে, বিষয়ী আর সত্তাকে আলাদা আলাদা জিনিস বলে ধরেছি। ভাষার কথা উঠলে যে কতকগুলো জিনিস নিজে থেকেই উঠে আসে —সেগুলোর ওপর সবার আগে আলো ফেলা দরকার।

ভাষা বললেই বোঝায় ভাষী আমি। ভাষা বললেই বোঝায় ভাষিক কৌম, আমরা—আমির আবাস। ভাষা বলতেই বোঝায় 'অপর' ভাষী, অপর ভাষিক কৌম—আমার ও আমাদের সঙ্গে যার বা যাদের কম-বেশি ফারাক।

আমিকে—আত্মবিষয়ী আয়তক্ষেত্র হিসেবে বুঝেছি। আমরা বলতে ঠিক কী বোঝায় অর্থাৎ 'আমরা' বলতে আমরা আক্ষরিক ভাবে কী বুঝি যদি আমরা-কে ইতিহাসের সঙ্গে পরম্পরা

সম্পর্কের নিরিখে না দেখা হয়? ইতিহাস বাদ দিলে আমরা কীভাবে বাস্তবতার অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে? আমরা-র এই আক্ষরিকতা ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বের করণীয় কী? আচ্ছা আর একটু সবুর করি। তার আগে দেখি, আক্ষরিকতার অংশ হিসেবে আমরা কী? আমরা-র সামগ্রিক সত্তাকে বুঝতে গেলে বুঝতে হবে এই আমরা-র ঐতিহাসিক সত্তাকে। বুঝতে হবে সত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, সামাজিক চুক্তির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। এই সত্য, এই সামাজিক চুক্তি : এই সম্বন্ধের বৃত্তে রয়েছে অপরও—হয় তারা অন্তর্ভুক্ত অস্তিত্ব, না-হয় বাদ পড়ে যাওয়া বিস্মৃত অস্তিত্ব। আমরা-র সঙ্গে তারা অন্যোন্য সম্বন্ধে থাকে। আমরা চিন্তা করতে পারি এবং এমন সত্তা যারা সত্যের সন্ধান চালাই। আমরা হয় সামাজিক চুক্তি মেনে নিই, নয়-তো মেনে নিই না।

আক্ষরিকতাই সত্য। সত্য কী? সত্য কি মিথ্যা নয়? মিথ্যা কি কাল্পনিক? সত্য কি কাল্পনিক নয়? সত্যকে জানবো কীভাবে? জ্ঞানের বিশ্লেষণই বা করবো কীভাবে? মনে পড়ছে তপন সিংহের ছবি "গল্প হলেও সত্যি"-র কথা। ওই ছবিতে যা করা হয়েছে তা আক্ষরিকতা। অর্থাৎ সত্য ঘটনা বলতে আমরা যা বুঝি—তা হল, ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যদি এমন ঘটনা কখনো না-ঘটে থাকে, বা ঘটনার অবয়ব দেখে বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটবে বলে আমার অভিজ্ঞতা প্রকল্পিতও করতে পারে না। তাকে আমরা বলি অলীক। এক্ষেত্রে অলীকের নামান্তর গল্প। মনে করুন সত্যজিৎ রায় 'পরশ পাথর' ছবি বানালেন। 'পরশ পাথর' তো অলীক। কিন্তু সেটা আক্ষরিক নয় এমন কথা কে বলবে। পরেশ দত্ত পাথরটা হাতে নিয়ে বলছেন, যা হয় না হতে পারে না। কিন্তু পরেশ দত্ত যে অবলম্বন ধরে কথা বলছেন সেটা বাস্তব, সত্য। না হলে তিনি বুঝবেন কী করে—পরশ পাথর, চতুষ্কোণ গোলাকার বস্তুর মতোই অলীক। সত্যজিৎ স্ট্যাটিউটারি লিখছেন : "এই ছায়াচিত্রে বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ইহাতে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি সচেতনভাবে কটাক্ষ করা হয় নাই।" অথচ সামগ্রিক ছবিটাতে প্রায় সমস্ত ঘটনামালা আমাদের অপরিচিত জগতের নয়। বাস্তব জগতের।

আক্ষরিক জগতে দাঁড়িয়ে আমাদের চিন্তার ইতিহাস মানে সত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের দিকটা বোঝা দরকার। সম্বন্ধের গোড়ায় পৌঁছোতে গেলে আমার মনে হয় ভাষাতত্ত্বের উঠোনে নামা দরকার।

ধরা যাক, আমি জন্ম থেকেই পশ্চিমবঙ্গে থাকি, শুধু আমি নই আমার বাপ চোদ্দ-পুরুষ এ রাজ্যের বাসিন্দা। কোনো কালে আমার পূর্বপুরুষ ভারতীয় রেলপথের কর্মী হিসেবে এ রাজ্যে চলে আসে। পরে কলকাতায় চলে আসে। আমি নির্দ্বিধায়, বাঙালিদের মতোই বাংলা বলি। আমি আমার বাড়িতে তেলুগু ভাষায় কথা বলি। তা সত্ত্বেও আমি একই সঙ্গে নিজেকে বাঙালি ও তেলুগুভাষী বলতে পারবো না। কেন?

আমার বন্ধু প্রভাস নিজেকে একই সঙ্গে বাঙালি ও বাংলাভাষী বলতে পারে, আমি পারি না। এইখানেই আমরা-র গল্পটা তৈরি হয়। প্রভাস এক একভাষিক আমরা-র মধ্যে বাস করে। আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করি অপর কৌমের মধ্যে। সেখানে রাষ্ট্র প্রদত্ত আমার সত্তা, আমরা-র

থেকে আমায় বিচ্ছিন্ন করে। ইতিহাস আমায় বিচ্ছিন্ন করে। বিষয়ী বেঁচে বর্তে থাকে বিভিন্ন সত্তাগত সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে। সংস্কৃতির ইতিহাসে দেখা গেছে বিষয়ের সঙ্গে সে সম্বন্ধ কীভাবে প্রতিষ্ঠা করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ''শিক্ষা'' গ্রন্থের 'সংযোজন' অংশে বলছেন।[৬]

> ''কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট সত্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালি ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মতো ব্যবহার করিতেছিলেন, সুতরাং আদব-কায়দার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালি অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে 'নিদারুণ'। বিশেষণ-পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।''

আমি চূড়ান্ত একভাষিক। একথা আমার নিজের কাছেই অস্পষ্ট যতক্ষণ না আমি একটা গোটা ভাষাতাত্ত্বিক আমরা-র অংশ। এখানেই দরকার ভাষাতত্ত্বের। ভাষাতত্ত্বই রাষ্ট্রকে ভাষাভিত্তিক নানান বর্গ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আমি তো একা একা স্মৃতিচারণ করতে পারি না। আমার তখন দরকার হয় অপরের সঙ্গে সম্বন্ধের। যখন কেউ নিজেকে নিয়ে পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে আমি-র সঙ্গে সম্বন্ধের নিরিখে—তখন আমি বুঝতে পারি নিজেকে। বুঝতে পেরে নিজেকে যতটা পারা যায় ডিসপ্লেস করি অপর-এর মতো করে, রাষ্ট্রের পরিচিত পরিচয়ের চেনা রাস্তা ধরে। নিজেকে উপস্থাপিত করি বিষয়ী হিসেবে, যা—যেন, কারুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বা কম মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত—বরং অনেক বেশি নিজস্ব। এটা যদি কেউ বলে সংগঠিত মিথ্যে—তাহলে আমার প্রকল্প ধ্বসে পড়ে। যে নিয়ন্ত্রণকে প্রত্নবিষয়ীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিকারক উপাদান বলে ভাবি—সেই নিয়ন্ত্রণ এবং অপরের সঙ্গে সম্বন্ধের সূত্রগুলোই তখন প্রত্নবিষয়ীর পুনর্গঠনের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। ভাষার কিছু মূল্যবোধ সামান্য ধর্মে রয়েছে— যা বিশ্বজনিন, সাংগঠনিক আবার একই সঙ্গে উত্তরিত। সেই ভাষায় যখন আমি নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করি—তখন আসলে সেই নিরপেক্ষ অস্তিত্বশীল ভাষা আর আমার মধ্যে একটা সম্বন্ধ তৈরি হয়। সেই সম্বন্ধই আমার অন্তঃসারের পরিচয় হয়ে ওঠে—সেই হয়ে ওঠার পেছনে কাজ করে রাষ্ট্র।

শুধু আমার নয়—সেই সম্বন্ধ আমার মতো অনেকেরই অন্তঃসারকের সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করে ওই ভাষা। আমার মতোই প্রত্যেকে নিজের নিজের স্মৃতি ও আত্মজীবনীর কথা বলতে পারে। বস্তুত আমি সে-ভাষাকে আমার নিজের করে পেয়েছি অনেক পরে। প্রথমত আমি সচেতন অবস্থায় দেখতে শিখেছি একটাই মাত্র ভাষা — সে ভাষায় অনেকে মিলে কথা বলে। আমি আমার অবস্থানে আমার চেতনে কখনো এমন পাইনি যে, আমরা অনেকেই অনেক ভাষায় কথা বলি। পেয়েছি, আমরা সবাই এক ভাষাতেই কথা বলি। আমি ছোট বয়স থেকেই ভাবতে শিখেছি—বহুভাষিকতা বলে কিছু হয় না—আমার সঙ্গে আমার ভাষার যে

সম্বন্ধ— তার শব্দভাণ্ডার তার পদ তার গঠনের পুরোটাই আমার নিজের হয়ে উঠেছেও বটে আবার ওঠেনিও বটে। ওঠেনি বলেই আমায় তো আমার ভাষারই ব্যাকরণ ইস্কুলে শিখতে হয়—যেন অন্য কারুর ভাষা।

বহুভাষিকতাকে চাপা দেয় রাষ্ট্র। তার সীমা-পরিধি-সীমারেখাগুলোকে সজীব সজাগ ও সমৃদ্ধ রাখার জন্য। বিষয়ীকে চাপ দেয় একভাষিক পরিচয়ে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সাবেক ঐতিহ্যকে মূল্যবোধ হিসেবে চালান করার জন্য নানাভাষার কথা নানাধর্মের নানা সংস্কৃতির কথা বলে। সেখানে নানাত্ব পাশাপাশি অবস্থিত সমগ্র তৈরি করে। কেউ কারুর ঘরে ঢুকতে পায় না। এবং যাদের ঘর নেই তারা সেই নানাত্বে ঠাঁই পায় না। যেহেতু এমন হয়, বা বলা যায় যখন এমন হয়—বিষয়ীর কাছে তখন ওই ভাষাকে বর্ণনা করার জন্য ওই ভাষা ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষাই থাকে না। সেই ভাষা নিজেকে নিজেই ব্যাখ্যা করার রাস্তা হয়ে ওঠে।

মানুষ কীভাবে নিজেকে বিষয়ী হিসেবে গঠন করে? এই গঠনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভূমিকা অপার। প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের ওপর ক্ষমতার যে অনুশীলন চলে—সেই অনুশীলিত পটভূমিকায় বিষয়ীর সংগঠন তৈরি হয়। এই পটভূমিকায় দেখতে হবে কীভাবে বিষয়ী রাজনৈতিক স্বরাজ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলায় কাজ করে!

৪. বহুভাষিকতা বনাম একভাষিকতা

অনেক ভাষার ব্যাপার বোঝাতে ইংরিজিতে দুটো শব্দ চলে : মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম আর প্লুরিলিঙ্গুয়ালিজম। মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজমের বাংলা করা যাক নানাভাষিকতা। দ্বিতীয়টার বাংলা তো বহুভাষিকতা। ইংরিজিতে সমাজ-ভাষা-রাজনীতির লেখালেখির বৃত্তে দ্বিতীয় শব্দটার ব্যবহার অল্প, প্রথমটার বেশি। ভারতবর্ষের ভাষা-পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকজন গবেষক দ্বিতীয় শব্দটা ব্যবহার করেছেন। আমি মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজমের বাংলা করতে গিয়ে কিঞ্চিৎ উদ্ভটত্বের আমদানি করলাম তার বাইরের কারণ দুই শব্দের ভেদ বোঝানো। বাংলা লেখালেখির জগতে ইংরিজি দুটো শব্দেরই বাংলা অনেক সময় ভুলবশত করা হয় বহুভাষিকতা। আর ভেতরের কারণটা পরে বলছি।

ভারতবর্ষের সামাজিক চেহারা উপনিবেশের আগে কেমন ছিল তা নিয়ে ইংরিজি ও বাংলায় বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। সেগুলো এখানে আর পুনরাবৃত্তি করছি না। তবে যা লিখছি তাতে নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী সেই সমস্ত কাজগুলোর প্রভাব রয়েছে।

ভারতবর্ষ বলে শুধু নয়, বা দক্ষিণ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চরিত্র বলেও নয়—আমার ধারণা সমগ্র গ্রহেরই সামাজিক চরিত্র বহুভাষিক ছিল। এখানে কতগুলো হিসেব মাথায় রাখা দরকার। প্রথমত সমগ্র গ্রহে কৌমের মনস্তাত্ত্বিক গঠনের কোনো সমমাত্রিক বিবর্তন ঘটেনি। ফলে কৌমের পরিচয়বাহী চিহ্নগুলোর ক্ষেত্রে সমমাত্রিক বিকাশের পরম্পরা নেই। থাকার কথাও নয়। তাই পৃথিবীর বুকে এক-এক জায়গায় কৌমের বিকাশ এক-এক ভাবে হয়েছে। পৃথিবীর ৬৫% মানুষ হয় দ্বিভাষিক অথবা নানাভাষিক। অর্থাৎ এই গ্রহের অর্ধেকের বেশি লোক দ্বিভাষিক বা নানাভাষিক। যদিও বহুভাষিকতার হিসেবে পৃথিবীর কত শতাংশ মানুষ

সামর্থ্যের সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে—তার হিসেব আমার জানা নেই। নানাভাষিক আর বহুভাষিক কথাদুটোকে আলাদা করার ভেতরের কারণটা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া দরকার—যাতে বহুভাষিক ও একভাষিকের দ্বন্দ্বের জায়গাটা বোঝা যায়। *বহুভাষিককে আমি বলছি প্রত্নবিষয়ীর সামর্থ্যের দিক। এখানে বহু মানে একের বেশি। দুটো ভাষা কেউ জানলেও যদি—তার সেই জানা সামর্থ্য হয় তখন তাকে বলছি বহুভাষিক। সামর্থ্যের জায়গা বুঝতে গেলে দেখতে হবে শিশু সামর্থ্য নিয়ে যে পরিবেশে জন্মায় সেখানে সে নিজে থেকেই একাধিক ভাষা বলবার ক্ষমতা অর্জন করে।*[৭]

আর অন্যদিকে দ্বিভাষিকতা ও নানাভাষিকতার ক্ষেত্রে দেখা হয়, একজন মানুষ দুটো ভাষা, বা নানা ভাষা ব্যবহার করতে জানে। অর্থাৎ এত রকম ভাষার ব্যবহার তার নির্বাহের দিক। বহুভাষিকতার ক্ষেত্র হবে যে সমস্ত ভাষা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও পারস্পরিক সমঝোতা ও বোধগম্যতা-সমেত পাশাপাশি প্রাকৃতিক (সামাজিক)-ভাবে অবস্থিত। একজন মানুষ যিনি বাংলা, ওড়িয়া, সাঁওতালী ভাষায় কথা বলতে পারেন, এগুলো তাঁকে ইস্কুলে শিখতে হয়নি। আবার ধরুন একজন কামতাভাষী মানুষ অনায়াসে বাংলা ও রাভা ভাষায় কথা বলতে পারেন—তাঁকেও ইস্কুলে শিখতে হয়নি। কথা বলতে বলতে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় সরে যেতে পারেন। এঁরা বহুভাষিক। আর একজন মানুষ, ধরা যাক যাঁর রাষ্ট্রীয় পরিচয় তিনি বাঙালি—তিনি ইংরিজি, ফরাসি, এসপেরান্তো, জর্মান প্রভৃতি ভাষা জানেন, ব্যবহার করতে জানেন, ওই সমস্ত ভাষায় লেখা বই পড়তে পারেন। লিখতেও পারেন বলতেও পারেন। তিনি কিন্তু নানাভাষিক অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে মাল্টিলিঙ্গুয়াল বলে। মাল্টিলিঙ্গুয়াল মানুষকে অনেক সময় বহুভাষাবিদ্ ওরফে পলিগ্লটও বলা হয়। যদিও আমি বহুভাষাবিদকে আরো এক কাঠি ওপরে রাখবো। যাঁদের বহুভাষা বিষয়ক জ্ঞান শুধু ভাষার ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ভাষার ব্যাকরণ, সাহিত্যের মধ্যেও প্রসারিত তাঁদেরকেই বলবো বহুভাষাবিদ।

এখানেই রয়েছে প্রসঙ্গটা যেটা নিয়ে প্রধানত আমরা কথা বলতে চাইছি। আমি একজন সাঁওতালভাষী মানুষকে চিনি যিনি সাঁওতাল, বাংলা ছাড়াও আরো অন্তত পাঁচটি ভাষায় কথা বলতে পারেন। তিনি তাঁর সমস্ত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেই কিন্তু বহুভাষিক নাও হতে পারেন—একথা মনে রাখতে হবে। আবার একজন বাংলাভাষী, বিশেষত শহরের মানুষ সাঁওতালী ভাষা বা ওড়িয়া ভাষায় কথা বলতে পারবেন না। যদি না সেই মানুষটা কোনো-না-কোনোভাবে দীর্ঘদিন সাঁওতাল বা ওড়িয়া ভাষা ব্যবহার করা অভ্যেস না-করে থাকেন। আমি বলতে চাইছি, যদি এমন হত, এ বঙ্গে সাঁওতাল ভাষাই স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেক্ষেত্রে একজন সাঁওতালভাষী মানুষের ক্ষেত্রে ওই একই অসুবিধা হত।

দ্বিতীয়ত, একই পরিবেশে পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও একজন বাঙালি পরিচয়ধারী অত গভীরভাবে সাঁওতাল ভাষায় কথা বলতে পারেন না যতটা নির্ভুলভাবে একজন সাঁওতালভাষী বাংলা বলতে জানেন। এর কারণ কী?

এর কারণই হল বহুভাষিক বিষয়ী ও একভাষিক সত্তার দ্বন্দ্ব।[৮] এখন আমি নজর দিতে বলবো, দুজন মানুষের দিকে।

একবার এক সাঁওতাল গ্রামে গেছি। কোথায় বলবো না। কথা হচ্ছে সাঁওতালভাষী বৃদ্ধ, মোড়ল কাকার সঙ্গে। মোড়ল কাকার কাছে আমি অসহায়। তিনি আমার সাথে বাংলায় কথা বলছেন। আবার দরকার মতো নিজেদের মধ্যে সাঁওতালী ভাষায় কথা বলছেন। তিনি যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করছেন, সে বাংলা 'আমার' নয়। তবে তাঁর বাংলা 'আমার' বাংলার খুব কাছাকাছি। অর্থাৎ তাঁর কথা কছাকাছি বলেই আমার বোধগম্য হচ্ছে। ওদিকে তাঁর সাঁওতালী ভাষা আমি বিন্দু-বিসর্গ বুঝি না। অথচ তিনি আমার ভাষাতেও দক্ষ, দক্ষ ভাষী, ভাষী না হলেও সমঝদার। মোড়ল কাকা আর এক রকম ভাষায় কথা বলতে পারেন। হিন্দীর এক নিজের মতো তৈরি করে নেওয়া বৈচিত্র্য। এমতাবস্থায় আমি তো অসহায় বটেই। কারণ আমি তো হিন্দীর কোনো বৈচিত্র্যই বলতে পারি না।

আমি নির্ভুলভাবে বাংলা ভাষা বলতে ও লিখতে পারি। নির্ভুল বাংলা ভাষা বলে তাহলে কি কিছু হয়? আমার 'আমি'-র যে নির্মাণ তার চারপাশে এই রকমই কিছু স্থিতিশীল ধারণার স্তম্ভ রয়েছে। এই ধারণাগুলো নির্ভুলতার ধারণা থেকে এসেছে। নির্ভুলতা বলে আদৌ কিছু কি হয়? ধরা যাক আপনাকে আমি একটা আমের ছবি আঁকতে দিলাম। আপনি আঁকলেন এবং তাতে গাঢ় সবুজ রঙ দিলেন। বিচারক বললেন, সবুজ রঙের জায়গায় একটু হলুদ আর লাল মিশিয়ে দিন তাহলে ছবিটা একবারে নির্ভুল হবে—সঠিক আমের ছবি হবে। ওটা আসলে নির্ভুলতার ধারণার একটা অধ্যাস বা ইল্যুশন। বিচারক আমের রূপান্তর ভুলে গিয়ে পাকা আমের চেহারাটাকেই একটা অক্ষত স্থিতিশীল অবস্থা হিসেবে দেখছেন। ভাষার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। জগতে কোনো কিছুই স্থিতিশীল নয়। ভাষাও নয়। তাই "নির্ভুল ভাষা" বলে জিনিসটা অধ্যাস। ব্যাকরণ সেই অধ্যাসের ক্ষেত্র। বরং নির্ভুলতার ধারণা বর্জন করাটাই নির্ভুলভাবে করা দরকার। তার ফলে বিশেষ করে বহুভাষিক ক্ষেত্রে পরিবেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে বলেই আশা করা যায়। কামনার কারণকে বিসর্জন দিতে পারলেই অর্ধেক কাজ সারা হয়ে যায়।

আমিই আসলে ত্রুটিপূর্ণ। "নির্ভুলভাবে বাংলা বলতে পারি"-এই মন্তব্যেই ত্রুটি রয়েছে। আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না এই ত্রুটি যদি না মোড়লকাকা বলতেন, তুই আমাদের সঙ্গে থাক, আমরা কী খাই খা, আমি কী পড়ি পড়, সারাদিনে আমরা কী করি আমাদের সঙ্গে থেকে দেখ—তবে তো বুঝবি, তবে তো জানবি আমরা কেমন! এই ক-মুহূর্ত দেখে কী বুঝবি তুই।

মোড়লকাকা এই ভাষায় কথাগুলো বলেননি। আমি তাঁকে উপস্থাপন করছি আমার ভাষায়—যে ভাষা শহরের, যে ভাষা মান্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে যে ভাষা। অথচ আমি বলছি আমার ভাষা। ওদিকে মোড়লকাকা একবারও বলেননি এই একবাচনিক সর্বনামটি। আমার গৌরবে একবচন।

মোড়লকাকা সগৌরবে বলছেন আমরা সাঁওতাল।

এখানে পাঠককে খেয়াল রাখতে বলব, শুধুমাত্র মেডিয়েটর বুঝলেই ভাষিক পরিস্থিতির বিকাশের গল্পটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে না। যে প্রস্তাব নিয়ে শুরু করেছিলাম সেদিকে এবার আরও গভীরভাবে তাকানোর সময় এসেছে। প্রস্তাবের কয়েকটি বহর লক্ষ করা যাক।

বহর এক : আমার ভাষা মহান, সে ভাষার খাদ্য ছোট ভাষা।

বহর দুই : আমার ভাষাও মহান, আমার ভাষাও ছোট ভাষা খাচ্ছে আজকাল। বহর একের ভাষার সঙ্গে আমার ভাব।

বহর তিন : আমার ভাষা মহান, আমার ভাষা কোনো ভাষা খায় না, অনুশীলনের মধ্যেই নিজের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। আমার ভাষা কেউ খেতে এলে আমি ছেড়ে কথা বলব না। কোনো অনুদান আমি নেব না। বরং বিদ্রোহ করবো। আমারও ঠিক সেই সেই জিনিস দরকার যা এক নম্বর বহরের আছে।

বহর অমুক : আমার ভাষা মহান নয়। হে প্রভু তোমার গৃহে আমায় আশ্রয় দাও। যায় যদি যাক ভাষা, প্রভু আমার মহান।

বহর চার : আমার ভাষা মরতে বসেছে, বণিক সমাজ মোটা অনুদান দিয়ে আমার ভাষাকে শো-কেসে ভরে সাজিয়ে রাখছে। আমার আপত্তি নেই। আমার ছেলে-মেয়ে খেয়ে পড়ে বাঁচবে।

বহর পাঁচ : আমি তো জানি না আমার ভাষা কী? আমার কোনো ভাষা নেই কেবল বুলি আছে।

ছ' নম্বর বহরে এসে পরিচয় গুলিয়ে যায়। এক থেকে পাঁচ তো ঠিকই আছে। পরিচয়ের ক্রাইসিস রয়েছে মাত্র দুটো বহরে, তিন এবং অমুকে।

অনেক বিতর্কের মধ্যেই ঘোরা ফেরা করে প্রশ্নটা : পরিচয়, যখন সামগ্রিক এক সত্তার তখন কী বলবো! একভাষিকতা, এক সংস্কৃতি মনস্কতা, এক জাতীয়তা, এক নাগরিকত্ব—পরিচয় কীসে? বিষয়ীর পরিচয় কোনটা? সেটাও কি সত্তার পরিচয়ের সূত্রেই আবদ্ধ? শুধু তাই নয়—এই যে আমি, আমি-আমি করছি—আমি সংঘবদ্ধভাবে বাঙালি বলবার আগেই কি এমন বস্তু যা ওই আমি-র মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি জোর করে, একটা পরিচয়ের ভাব এনে।

বাড়িতে যখন পৌঁছোই অফিস থেকে—তখন কলিং বেলের শব্দে ভেতর থেকে 'কে' বলে প্রশ্ন এলে আমি যেমন উত্তর দিই 'আমি'। আমার গলার আওয়াজ বাড়ির লোক চেনেন তাই আর কথা বাড়ান না। কিন্তু আমি দরজার এপার থেকে যখন বলি 'আমি' — তখন সেটা অনেকটা আমি-তেই পর্যবসিত হয়। আমি সে বা আর কেউ নয় আমি-ই। আমি তখন আমার পরিচয়ের সঙ্গে আমার যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধের সেতু সেই সেতু থেকে বহু দূরে অবস্থান করছি। তখন আসলে কী বলতে চাইছি আমি?

এই আমি তো মোড়লকাকারও আছে।

কিন্তু শেষোক্ত বহরের বৃত্ত কোনো মানুষের আছে কিনা আমার জানা নেই। আমার মতে এই সমস্ত বৃত্ত ও শব্দগুলোই সমস্যাসঙ্কুল। মোড়লকাকাকেই ধরুন না।

মোড়লকাকা বলছেন আমরা সাঁওতাল। ওঁর নাগরিকত্ব পশ্চিমবঙ্গের, বাংলা ভাগ না হলে—বলা হত উনি বাংলার নাগরিক। উনি সেটা জানেন। নিজের অজান্তেই সামঝোতা করেন। উনি একই সঙ্গে সাঁওতাল সমাজ এবং বাংলার নাগরিক। এবং ভারতীয়। উনি বোঝেন ওঁর যে সাঁওতাল সত্তা— সে সত্তার বাজারদর আজকাল ভালোই যাচ্ছে। উনি বহর দুই-য়ের।

আমি-তোমারই-মত। এই শব্দসারি পুনরাবর্তিত হয়ে চলেছে এক বৃত্তে : আমি (আমি-তোমারই-মত)$_{তোমারই}$) -মত)$_{তোমারই}$-মত, ইত্যাদি।

৫. গোলকায়নে ভাষার মৃত্যু না নবজীবন

আজকের অবস্থাটা নিঃসন্দেহে আরও জটিল। রাষ্ট্রীয় চরিত্রের সঙ্গে এক ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল বিষয়ী। আজকে সে ধন্ধে থাকে। কারণ খাপ খাইয়ে না নিলে রাষ্ট্র চাপ দিত। হয় সেপাই দিয়ে ঠেঙিয়ে না-হয় যন্তর-মন্তরে মগজ ধোলাই করে। জনগণমনঅধিনায়কের নামে জয়গাথা গাইতো রাষ্ট্রের সব ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো। কিন্তু যারা ছোটর ছোট, যারা গৃহীত ছিল না (শর্তসাপেক্ষ গ্রহণে যারা রাজি হত না তারা ছিল বর্জিত) -- তারা নিজেদের মত করে বঙ্কিম চাটুজ্জে, রামমোহন জুটিয়ে নিজেদের ইতিহাসের সপক্ষে সওয়াল করতো। সেই সওয়াল ছিল রাজদ্রোহিতা। আজও যে কারণে কানহাইয়া রাজদ্রোহী। সোজা-সাপটা হিসেব জটিল হয়ে উঠলো যখন সমস্ত বাজার খুলে গেল বিশ্বের দরবারে। জোয়ার আসতে শুরু করলো ঋণের, বোঝা বেড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য কেউ খেয়াল করলো না।

আমি নাগরিক সমাজের কথা বলছি। আসলে বাজার খুলে যাওয়াতে পণ্য ও সংস্কৃতি এক সঙ্গে আসা-যাওয়া শুরু করল। যেখানে পুঁজিবাদ ধর্মের ভূমিকা গ্রহণ করল। রাষ্ট্রকে এই নতুন বণিক সম্প্রদায় বলল, তুমি তোমার মত থাকো। তোমার লিগ্যাসি আমি কেড়ে নিচ্ছিনা। কেড়ে যে নেয়নি সে প্রমাণতো আজও মেলে। গো-মাংস খেলে দেশ ছেড়ে দিতে হবে বলে রাষ্ট্র হুমকি দেয়। গোলকায়নের নেতারা এ সব করেন না। তারা একই সঙ্গে বিষয়ীর বিষয়ীত্ব ও সামগ্রিক (= আন্তর্জাতিক?) সামান্য চরিত্র তৈরি করে। খেয়াল করি না তখন আমি যে আমাকে দেখি সে আমি নতুন বণিক সম্প্রদায়ের নেতাদের হাতে তৈরি। তারা বাণিজ্যের স্বার্থে বিষয়ীর নকল বিষয়ী বানিয়ে রাখেন — যাতে বিপ্লব বিদ্রোহ কখনো দানা না বাঁধে। আর বিপ্লব বিদ্রোহ যদি বা দানা বাঁধলো—গোলকায়নে তারও স্বীকৃতির ব্যবস্থা রয়েছে।

এই যে হঠাৎ করে এসে যাওয়া নতুন যুগ—আমার সংস্কৃতি, আমার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। আমার পরিচয়কে নতুন ভাবে রূপ দিচ্ছে। আমার রাষ্ট্রসত্তার নানা দিক নানা ভাবে সেজে উঠেছে নতুন নতুন পোশাকে। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নতুন যুগের হাওয়া শাসনের মতো এসে চেপে বসে নাগরিক মনের ওপর। তবে সেই হাওয়ায় প্রত্নবিষয়ীর কিছু এসে যাওয়ার কথা নয়। যদি না বিষয়ী 'যুগ'-কে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়। একটা কথা খেয়াল রাখা জরুরি—যুগ, সমাজ, রাষ্ট্র—এসবই তো বানানো—আপাতত—'আমি না থাকলেও চলতো'-র পরিসরে প্রত্নবিষয়ীকে জাগিয়ে তোলার কাজ বেছে নিতে হবে। আত্মসত্তার প্রবল পরিচর্যার জায়গা তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ এই গ্রহের ভবিষ্যতের কথা ভেবে 'আর সমস্ত' সত্তাগুলো জলাঞ্জলি দিলেও চলে—এই বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। মানুষ তো প্রাকৃতিক জীব নয় আর, সে এখন প্রকৃতির বাইরে নিজেকে বসিয়েছে। তার অবস্থিতি—অর্থাৎ বিভিন্ন সত্তার হাত ধরে তার আত্মপ্রকাশ প্রাকৃতিক জীবনের পরিপন্থী সে ক্ষেত্রে প্রত্নবিষয়ীর পুনর্গঠন তাকে নিসর্গের প্রান্তরে ফিরিয়ে নিতে পারে।

আমার পরিচয়—আজকের যুগের সংবর্তনের সময়ে নতুনভাবে বিবৃত হচ্ছে। যখন রাষ্ট্র তার

একপেশে নৈতিক নিয়ম-কানুন বিষয়ীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল তখন বিষয়ীর অন্তরে এক সুপ্ত ক্ষোভ ছিল। গোলকায়নে বিষয়ীকে এক আরাম-আয়েশের দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বিশেষ বিষয়ীর মনস্তত্ত্বের চাষ হয়। প্রত্যেককে যেন গোলকায়নের বিধাতারা আলাদা করে নির্মাণ করে। এতদিন সেটা হয়নি। বিষয়ীর নৃতাত্ত্বিক গুণাবলীকে গোলকায়ন নতুন করে নির্মাণ করে বিষয়ীর চোখের সামনে মেলে ধরে। বিষয়ী আর্শিনগরে বাস ক'রে ভাবে এই হচ্ছে আসল জগত; প্রযুক্তির বিকাশ, উন্নতি। গোলকায়নে নির্মিত প্রতিকৃতিকে ভাবে প্রতিবিম্বন—নিজেরই ছবি আয়নায়। একই সঙ্গে আত্মপ্রকল্প কৌমের বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিক ভূগোল—এই সমস্ত কিছু বিষয়কে মূল্যবোধের নির্দিষ্ট প্যাকেজ হিসেবে পেয়ে যায়।

ছোট কৌমের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যবহার করতে শিখেছে গোলকায়ন, রাষ্ট্র যেটা ব্যবহার করতো না। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার গোলকায়ন কৌমের ওই বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে তার নিজস্ব স্বতন্ত্র লক্ষণ চিহ্নিত করে তাকে রাষ্ট্রের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করছে না। বরং জাতি, ধর্মের ধারণাগুলোকে ঝকঝকে আরো বেশি পবিত্রতার মোড়কে মুড়িয়ে রাষ্ট্রের বন্ধু হয়েই কাজ করে যাচ্ছে। সে কারণেই তো সব রাষ্ট্রই গোলকায়নকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। গোলকায়নকে বিভিন্নভাবে কোনো কৌম অস্বীকার করলে সে জগতের মূল স্রোত থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কৌমগুলোর গঠন তো অবাধ নয়। ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, পরিবেশ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই কৌমের নির্মাণ হয়। আর এই উপাদানগুলোর মধ্যেই থাকে ধর্মীয় মৌলবাদ, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল সূত্রগুলো। তাই বিষয়ী এখন একই সঙ্গে রাষ্ট্র ও গোলকের নাগরিক।

আত্ম-প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে কৌমের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দরকার হয় আত্মসত্তাকে সত্য রূপে বিবৃত করা। সংজ্ঞায়িত করা। সত্য ওরফে বাস্তবই তো যত গণ্ডগোলের জায়গা—আগেই বলেছি। বিষয়ী যখন নিজেকে প্রকাশ করে বলে ''এই আমি'' — সেটা একটা সংগঠিত মিথ্যে — কারণ বিষয়ী নিজেকে তো জানেই না, তার নিজেকে জানার একমাত্র উপায় অপরের আয়নায় নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখা। বিষয়টা জটিল নয় মোটেই—কিন্তু অপরের আয়নাকে কেবলমাত্র নিরপেক্ষ বিষয় হিসেবে ধরে নেবো কীভাবে?

কাসেল (২০১০ : ৭৩) বলছেন,

> "First, social movements must be understood in their own terms : namely, they are what they say they are. Their practices (and foremost their discursive practices) are their self-definition. This approach takes us away from the hazardous task of interpreting the "true" consciousness of movement, as if they could only exist by revealing the "real" structural condition."

দ্বিতীয়ত, কাসেল বলছেন, সামাজিক আন্দোলনগুলো হয় সামাজিকভাবেই রক্ষণশীল, না-হয় সামাজিকভাবে বৈপ্লবিক, অথবা দুটোই নতুবা কোনোটাই নয়। তিনি সামাজিক বিবর্তনে

কোনো পূর্ব-নির্ধারিত নির্দেশিকতার পক্ষপাতিত্ব করছেন না। সুতরাং বাজে সামাজিক আন্দোলন বা ভালো সামাজিক আন্দোলন বলে কোনো কথা হয় না। সব আন্দোলনই সমাজের লক্ষণ—সমাজের গঠনে প্রভাব বিস্তার করে।

এখন কথা হচ্ছে, এই আন্দোলনগুলো কী চেহারায় অবশেষে পর্যবসিত হবে সে কথা মানুষ আগে থাকতে টের পায় না। যে ভাষীরা তাদের সারবৎ আমরা তৈরি করে লড়াই করছে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, আত্ম-পরিচয়ের জন্য — তাদের নিজত্বকে তারা কি সেই ভুলভাবেই নির্মাণ করে নিচ্ছে? কারণ গোলকায়নে নতুন বাণিজ্য প্রভুরা তো আন্দোলন, বিপ্লব, বিদ্রোহকেও স্পনসর করে। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকেও সমর্থন জানায়। সেখানেই তো মুশকিল। গোলকায়নের চরিত্র অনেকটা সেই পদ্মানদীর মাঝির ময়না দ্বীপের মত। রহস্যময়। তাই গোলকায়নের বিলুপ্ত ভাষাকে মিউজিয়ামে রাখা আর বিলুপ্তপ্রায় ভাষার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার নতুন স্কিমে সামিল আজকের ভাষাতাত্ত্বিকরা, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শ্রম এবং ছাত্র-উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে সস্তায় গ্রামে গঞ্জে দু-একদিনের ফিল্ড-ওয়ার্কে দু-তিন লাখ টাকার প্রকল্পকে সন্তুষ্ট রাখছে। রাষ্ট্রের অপরিহার্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিলুপ্তপ্রায় এবং প্রান্তিক ভাষাগুলোর শব্দ, বাক্য সংগৃহিত হচ্ছে সংরক্ষণের নামে। ভাষাতাত্ত্বিকমাত্রই তাদের গবেষণা ও পঠন-পাঠনের এলাকা নির্বিশেষে এখন বিলুপ্তপ্রায় ভাষার কর্মী। সমঝোতা ঘটে চলেছে অন্য জায়গায়। ছাত্র-পড়ানো ছাড়াও তাঁরা রাষ্ট্রের সামাজিক স্বাস্থ্যের প্রতি দায়বদ্ধ তার 'প্রমাণ' লিপিবদ্ধ থাকছে রাষ্ট্রের খাতায়।

আমি বলবো চিন্তা করুন। কাজ পরে করবেন। এখুনি ভাববেন পাল্টে দেবেন—কেবল ভাবুন ভাবতে হবে। নতুন করে। ভাবনার ইতিহাসে খুলতে হবে নতুন অধ্যায়।

৬. উপসংহার : একভাষিকতার ফলশ্রুতি ভাষার মৃত্যু

আজকের প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, জীববিদ্যা, জৈবরসায়নবিদ্যার নানান দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর ভাষা-বৈচিত্র্যের দৃষ্টবাদী ব্যাখ্যা করা হয়। এখনও ভাষা-সংক্রান্ত বহু বিষয় নিয়ে বিতর্কের অবসান হয়নি। তবে এমন কিছু সম্ভাব্য পথ বেরিয়ে এসেছে বিজ্ঞানের কর্মীদের সামনে যে পথগুলো দিয়ে হাঁটতে শুরু করলে অনেক দূর অবধি সিদ্ধান্তের তরফে এগোনো সম্ভব। সেটাও কম বড় কথা নয়। বিশেষত ভাষা কীভাবে ভেঙে গিয়ে অনেক ভাষা হয়ে যায়—সেই ভাষা থেকে ভাষান্তরে যাওয়ার রাস্তায় কী ঘটে চলেছে তার একটা জোরালো আভাস পাওয়া যাচ্ছে আজকের বৈজ্ঞানিক কাজগুলোয়। কাজগুলোর একটা সাধারণ জায়গা হচ্ছে—তাদের বেশিরভাগেরই যুক্তি : বিবর্তনের কোনো এক কালে এক ভাষা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক ভাষা। এক থেকে বিভিন্নতায়, কম থেকে বেশি বৈচিত্র্যে।[৯]

এখন প্রশ্ন হল, বিবর্তনের নিয়ম মেনে অন্যান্য প্রজাতি ও মানব ভাষার শাখা-প্রশাখা বেড়ে চলার কথা। কিন্তু তা তো হয় না। সভ্যতার একটা ধাপে এসে বিবর্তন থমকে দাঁড়ায়। যখন থেকে গ্রহের ভার আর প্রকৃতি নেয় না, সংস্কৃতি নিজের হাতে তুলে নেয় তখন থেকে তৈরি হয় সমস্যা। যে কারণে দামাসিওর প্রত্নসারসত্তার আলোচনাকে আরো জরুরি ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন না করে আমায় প্রত্নবিষয়ীর ধারণায় যেতে হল। সংস্কৃতি গ্রহের ভার নেবার পর থেকেই

বিবর্তনের শাখা-প্রশাখার বিস্তারের পথ যেন বন্ধ হয়ে যায়। ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। বিশেষ করে মানুষের সভ্যতা এই গ্রহের স্বাস্থ্যের পক্ষে এত ভয়ঙ্কর যে বলা হয়—পরবর্তী মহাবিলুপ্তির দায়িত্ব মানুষ একাই বহন করবে। সভ্যতার ক্ষেত্রে খুব সাংঘাতিকভাবে কাজ করেছে—মানুষের বুদ্ধি ও অন্যান্য চিত্তবৃত্তির অসম বিকাশ। যার প্রকাশ ঘটেছে ক্ষমতার বিন্যাসে আর ফলশ্রুতি হিসেবে একদিকে গড়ে উঠেছে মানুষের জোট, সংগঠন ইত্যাদি অন্যদিকে তৈরি হয়ে বৈষম্য, গ্রহণ-বর্জনের রাজনীতি এবং অতঃপর হত্যা। ভাষিক বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই ফলশ্রুতিই কাজ করেছে। ভাষার মৃত্যু, বৈচিত্র্য হ্রাস পাওয়া—তারই পরিণাম।

দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ভাষাবিজ্ঞানীরা বলে আসছেন ভাষায় ভাষায় শব্দভান্ডারগত, শব্দের গঠনগত, বাক্যের গঠনগত যে মিল রয়েছে—তার নিরিখ ধরেই ভাষা-বংশ ওরফে ভাষা-পরিবারের গঠন জেনে নেওয়া সম্ভব। বুঝে দেখুন এই যে বংশ, সে তো জোটেরই নামান্তর—সেখানে গ্রহণ-বর্জনের রাজনীতি তো কাজ করবেই। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে দেওয়া ১৭৮৬-তে ইউলিয়াম জোন্সের বক্তব্যে স্কলারশিপ ছিল না এ কথা বলছি না। বলছি জ্ঞানচর্চার অভিমুখ ঠিক করে দিয়েছিল এক বিশেষ ক্ষমতার বিন্যাস।

যাঁরা এই মুহূর্তে ভাষীর ডিএনএ-তে নির্দিষ্ট নিউক্লিওটয়েড পরম্পরার খোঁজ চালাচ্ছেন, তাঁরা ফোনেটিক ও ফাইলোজেনেটিক বিবর্তনকে সমাপতিত করে দেখতে চাইছেন ভাষার ছড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলো কেমন ছিল। ভালো কথা। তাঁরা মনে করছেন বিবর্তনের সমমাত্রায় খুব নিয়মনিষ্ঠভাবে ভাষাগুলো একটার থেকে আর একটায় আলাদা হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এ কথা বিশ্বাস করতেই হবে যে, যদি ভাষার ছড়িয়ে পড়ার নিয়ম ও মাত্রা আবিষ্কার করা যায়, অন্তত জীববৈজ্ঞানিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে—তাহলে হয়তো আজকের ভাষার মৃত্যুর একটা দিক আটকানো সম্ভব। খেয়াল রাখতে বলবো—ভাষার মৃত্যুকে শুধুই ক্ষমতার রাজনীতির ফসল বলে না ধরে, যদি কোথাও কোথাও ভাবা যায় প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে, তাহলে সেই মৃত্যু আটকানো সম্ভব কিনা বর্তমান বিজ্ঞান সে বিষয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যান্য জীব বৈচিত্র্যের সঙ্গে ভাষিক বৈচিত্র্যকেও তারা 'কোথাও কোথাও' সম-আপতনে দেখবার চেষ্টা করছেন। এ কথা তো গৌরবের বটেই।

আমার বক্তব্য, এই দেখবার চেষ্টার পাশাপাশি এক সৌজন্য, সমতার কথা, অহিংসার কথা, সংযমের কথা বলা দরকার। যে কথাগুলো প্রত্নবিষয়ীর কাঠামোকে জোরালো করে তুলে আত্মসত্তা নির্মাণে বিষয়ীর পাশে এসে দাঁড়াবে। পরিচর্যা করবে স্ব-এর। আমি এই সওয়ালই করলাম।

বইপত্র

Castells, Manuel (2010). *The power of identity : Second Edition with a New Preface.* UK : John Wiley & Sons.

Damasio, Antonio R. (1999). *The Feeling of What Happens : Body and Emotion in the Making of Consciousness.* New York : Harcourt Brace.

Parvizil, Josef and Damasio, Antonio R. (2001). "Consciousness and the brainstem." *Cognition 79* : 135-159.

অন্যান্য সূত্র

১. রাষ্ট্র অনেক রকম। বা বলা জরুরি এইভাবে ''ক্ষমতা'' শুধু রাষ্ট্রের ফর্ম বা আকারেই নাগরিকের ওপর বর্তায় না, ইউটিলিটি বা উপযোগিতা অনুযায়ী নানান আকার নেয়। রাষ্ট্র সব অর্থে জাতি-রাষ্ট্রও নয়। এমনও রাষ্ট্র হতে পারে যা নেশনের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। রাষ্ট্র এক অর্থে নাগরিকের — নিজেকে — নিজেদের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার জায়গা। এখানে এইটুকু বলে রাখা জরুরি জাতি-রাষ্ট্রের ইউরোপীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী জাতি-রাষ্ট্র গঠনের জন্য নাগরিকদের সমমাত্রিক ''পরিচয়'' নির্ধারিত হয় কখনো ভাষা কখনো ধর্ম কখনো নৃতাত্ত্বিকতা বা অন্যান্য সমসত্ব বিষয়ীত্বের ভিত্তিতে। আপাতত বোঝা দরকার যে—রাষ্ট্র একটা নির্দিষ্ট সীমানা অখণ্ড অক্ষুন্ন রাখার জন্য এক আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক গঠনকে চিহ্নিত করে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখতে পারেন : Butler, Judith and Spivak, Gayetri Chakravorty (2007). *Who Signs The Nation-State? : language, politics, belonging.* NY/Kolkata : Seagull Books.

২. ভারতীয় শাস্ত্রে সত্তা বলতে ''জাতিবিশেষ''-কে বোঝায়। তিন রকম পদার্থ, যেমন; দ্রব্য, গুণ আর কাজ — এই তিনে সত্তা স্বীকার করা হয়। দ্রব্য, গুণ ও কাজের সঙ্গে সত্তা সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তিন রকম অবস্থায় : নির্বিশেষ, বিশেষ আর সমবায়ে। যে জিনিসে সত্তা থাকে তাকে সৎ বলে। অভাব পদার্থ সৎ নয়—তাই কোনো কিছুর অভাবে সত্তা থাকে না। কিন্তু অভাব তো সোনার পাথরবাটি বা বৃত্তাকার চতুষ্কোণের মতো অলীক নয়। অভাব প্রমাণ সাপেক্ষও বটে। দুটো জিনিসের সম্বন্ধের মধ্যে অভাব ঘটলে সেখানে সম্বন্ধ সত্তা নেই। আবার রঘুনাথ শিরোমণি সত্তাকে জাতি হিসেবে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে ''ভাবত্বরূপ অখণ্ডোপাধিই সত্তা।'' কিন্তু অভাবের মধ্যে সত্তা স্বীকার না করলে—কোনো স্থানে কোনো কিছু নেই — তার প্রতীতী হবে কি করে? তাই আছে এবং নেই — দুই অর্থেই সত্তাকে ধরা উচিৎ। দ্র. ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন ও দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (সম্পা.) (১৯৭৮) *ভারতীয় দর্শন কোষ*, খণ্ড ১। কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ। পৃ. ১৬২।

৩. ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মাকে বলা হয়েছে চিত্তবৃত্তি, অনুভূতি ইত্যাদি আদি গুণের সমবায়িকারণ। ''আত্মত্বজাতির আশ্রয় আত্মা''। অর্থাৎ সত্তা জাতি, তাহলে তার আশ্রয় বিষয়ী। দ্র. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। (১৩৯০ ব.) *শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিত তর্কসংগ্রহঃ*। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, পৃ. ১৮৩। প্রত্নবিষয়ীকে এই হিসেবে আদি আত্মা ধরা যাক।

৪. ©BBC 2016. Story from BBC NEWS : http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/in_depth/8500108.stm, Published : 2010/02/05 12:02:19 GMT.

৫. চেমওয়াভি আদিবাসীদের একটা আস্ত ওয়েবসাইট রয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন। http://www.chemehuevi.net/

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শিক্ষা* গ্রন্থের 'সংযোজন' অংশে পাবেন ''ছাত্রশাসনতন্ত্র''। *রবীন্দ্র রচনাবলী* ষোড়শ খণ্ডের (১৪০৭ ব.) ২৯৬ পাতায় পাবেন মন্তব্যটা। অনলাইনে দেখুন : http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15053.

৭. একটা তথাকথিত ভাষাতাত্ত্বিক অঞ্চলে, ধরা যাক যেমন ''বাংলা বলা'' অঞ্চল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ, বিভিন্ন ভাষার সহাবস্থান—সেই রকম অঞ্চলের মধ্যে এক রকম অলিখিত সীমানা বজায় থাকে। যেমন, আমরা বলি পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল গ্রাম, টোটোপাড়া, যেখানে বিশেষ বিশেষ ভাষিক কৌমের থাকবার জায়গা। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় ব্যাপারটা অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট। খুবচন্দানি (১৯৯৭ : ৮৭-৯১) দেখিয়েছেন, "In a plural society, language identity alone, just as religious identity alone, cannot universally be regarded as defining membership in an exclusive group. Interlanguage boundaries in many regions in India have remained fuzzy and fluid." (সম্পূর্ণ গ্রন্থ পরিচয়ের জন্য : Khubchandani, Lachman M. (1997). *Revisualizing Boundaries : A PLurilingual Ethos.* New Delhi : Sage Publication India Pvt. Ltd.)

৮. এই বহুভাষিক ও একভাষিক অবস্থাটা অনেকটা অন্যোন্যাশ্রয়ের মত। পরস্পরের উৎপত্তি, স্থিতিশীলতা বা জ্ঞানের লক্ষণে ''পরস্পরের অপেক্ষা'' থাকে। দ্র. ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন ও দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (সম্পা.) (১৯৭৮) *ভারতীয় দর্শন কোষ*, খণ্ড ১। কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ। পৃ. ১৭।

৯. খুবচন্দানি (১৯৯৭ : ১২০) বলছেন : "The intensity of intergroup and intercultural communication through various contact languages in the country testifies to the strength of a plural ethos built over the ages. Pluralistic communities organize this verbal repertoire through various process of language contact, namely, loan-proneness, 'open-ended' lexical shift, relexicalization, diglossic complementation, code-switching / mixing. bilingualism and so on."